ভাষা : মানুষের সমস্যা

মনসুর মুসা*

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে একটি জার্নাল বিগত প্রায় সত্তর বছর ধরে প্রকাশিত হয়ে আসছে। জার্নালটির নাম 'ডডালাস'। এর একটি উপশিরোনাম আছে: **জার্নাল অব দি এমেরিকান একাডেমি অব আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস**। নামটি একটু বিদঘুটে। উচ্চারণও নানা প্রকার। ব্যুৎপত্তিও গোলমেলে। গ্রিসের কল্পকাহিনি থেকে রোমান সাহিত্যে এসেছে। সেখান থেকে ইংরেজি হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসেছে। উচ্চারণ নিয়ে বিতর্ক আছে দু দেশে দু রকম। বাংলায় লেখা হয় 'ডডালাস'।

এই জার্নালের একটি সংখ্যা ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল, যার বিষয় ছিল: 'ভাষা–মানুষের সমস্যা' ইংরেজিতে 'ল্যাঙ্গুয়েজ এজ এ হিউম্যান প্রবলেম'। তখনকার দিনের ১৭ জন বিদ্বান ব্যক্তি এই প্রবন্ধগুলো লিখেছিলেন। এই প্রবন্ধগুলোকে তিনটি গুচ্ছে ভাগ করে পরিচিহ্নিত করা হয়েছিল। সেগুলো হল: ভাষার বিচিত্রতা, ভাষা শেখা এবং ভাষার বৃত্তি।

প্রথম প্রবন্ধটি লিখেছিলেন আইনার হাউগেন (১৯০৬-১৯৯৪)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাঁরা সমাজবিজ্ঞান এবং দ্বিভাষিকতা নিয়ে কাজ করেছেন তিনি তাঁদের একজন। আরো একজনের নাম এখানে বলা যায় তিনি হচ্ছেন চার্লস ফার্গুসন (১৯২৯-১৯৯৮)। তিনি বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্ব নিয়ে কাজ করেছেন। চার্লস ফার্গুসন ও মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১) যৌথভাবে 'The Bengali Phoneme' শীর্ষক বিখ্যাত প্রবন্ধটি লিখেছিলেন ১৯৬০ সালে। সেটা *Language* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

ডডালাসে যে প্রবন্ধগুলো লেখা হয়েছে সেগুলোর মূল লক্ষ্য ছিল ভাষাকে মানবীয় সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা। বিবেচনা করতে গিয়ে রচয়িতারা প্রত্যেকে নিজ নিজ বিষয়-জ্ঞান ও বিষয়-অভিজ্ঞতার দিক থেকে দেখার চেষ্টা করেছেন। দুটো মুখবন্ধ লেখা হয়েছে, একটি লিখেছেন আইনার হাউগেন; অপরটি লিখেছেন মর্টন ব্লুমফিল্ড (১৯১৩-১৯৮৭)। দুজনেই ভাষা সমস্যার তিনটি দিক সম্বন্ধে একমত হয়েছিলেন।

---

*অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভাষার বিচিত্রতা ও সংগ্রন্থনা

একই ভাষার মধ্যে বৈচিত্র্য আছে। বৈচিত্র্য অসংখ্য। আঞ্চলিক বৈচিত্র্য আছে, সম্প্রদায়গত বৈচিত্র্য আছে, নর-নারীর ভাষার বৈচিত্র্য আছে, বয়ঃক্রমিক বৈচিত্র্য আছে, ব্যক্তিক বৈচিত্র্য আছে, সাংকেতিক বৈচিত্র্য আছে। বৈচিত্র্য নগণ্য নয়, অগণ্য। এক্ষেত্রে বাংলা ভাষার বৈচিত্র্য সম্বন্ধে মুনীর চৌধুরীর একটি উক্তি উদ্ধার করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন –

> "আমার মাতৃভাষা কি? বাংলা ভাষা। সমগ্র বাংলা ভাষা। বিচিত্র রূপিনি বাংলা ভাষা। অভিধানে আছে ষোড়শ রমণী মাতৃ সম্বোধনীযোগ্যা। শ্বশ্রু থেকে তনয়া, গর্ভধারিণী থেকে পিতৃরমণী। ষোল নয়, আমার মাতৃভাষার ষোলশত রূপ। তারা সব পদ্মিনীর সহচরী। আমার মাতৃভাষা তিব্বতের গুহাচারী, মনসার দর্পচূর্ণকারী, আরাকানের রাজসভার মণিময় অলংকার, বরেন্দ্রভূমির বাউলের উদাস আহ্বান, মাইকেল-রবীন্দ্রনাথ-নজরুল ইসলাম আমার মাতৃভাষা। আমার মাতৃভাষা বাংলা ভাষা।"

ভাষার বিচিত্রতা যে একটি সমস্যা বাংলা ভাষার এ সংজ্ঞা থেকেও তা উপলব্ধি করা যায়।

ডডালাসে দ্বিতীয় যে সমস্যাটি পরিচিহ্নিত করা হয়েছিল তা হচ্ছে, 'ভাষা শেখা'। ভাষা দুভাবে পরিচায়িত হয়। একটি স্বভাষা, দ্বিতীয়টি পরভাষা। স্বভাষা শেখার প্রকৃতি-পদ্ধতি একরকম; আর পরভাষা শেখার প্রকৃতি-পদ্ধতি আরেক রকম। স্বভাষাকে আমরা সচরাচর মাতৃভাষা বলে থাকি, আর পণ্ডিতেরা বলেন 'প্রথম ভাষা'। জন্মসূত্রে শিশুরা যে ভাষা অর্জন করে তা তার প্রথম ভাষা, আর কর্মসূত্রে যে ভাষা রপ্ত করে তা তার পরভাষা। পণ্ডিতেরা বলেন, দ্বিতীয় ভাষা। প্রথম ভাষা ও দ্বিতীয় ভাষা একদিকে যেমন সম্পদ; অপরদিকে তেমন বোঝা। অর্থাৎ শিখলে বা জানলে তা সম্পদ, আর না শিখলে বা না জানলে তা বোঝা।

যে কথা শুনতে পায় না, সে কথা বলতেও পারে না। সে নির্বাক। সহজ কথায় আমরা বলি যে কালা, সে বোবা। সে প্রথম ভাষাও জানে না, দ্বিতীয় ভাষাও জানে না। সে নিঃস্ব-দরিদ্র, ভাগ্যাহত। সে আলোচনা আমাদের দেশের অগ্রগণ্য তুলনামূলক শব্দবিদ্যার বিদ্বানেরা আলোচনায় পাংক্তেয় মনে করেননি। যেহেতু এটা করা তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল না, তাঁরা সেদিকে পথ হাতড়াতে যাননি। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল কোন্ ভাষার সাথে কোন্ ভাষা সম্পর্কিত ছিল কিংবা আছে, এই সম্পর্ক নির্ধারণ করা। তাঁদের কাছে পুরো ব্যাপারটি ছিল 'টাওয়ার অব বাবেলে'র হারিয়ে যাওয়া শাখা-প্রশাখাগুলোর সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য অনুসন্ধান করা। ভাষা-বংশ অনুসন্ধান করে তাদের অনুমিত তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা। তাঁরা যুগের পর যুগ অনুসন্ধান করে তুলনামূলক ঐতিহাসিক শব্দবিদ্যার শাস্ত্রটি গড়ে তুলেছিলেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল ভাষার জন্ম-বৃত্তান্ত ও বংশ-ধারা নির্ধারণ করা।

টাওয়ার অব বাবেলের বিষয় নিয়ে একটি লেখা 'ল্যাঙ্গুয়েজ এজ হিউম্যান প্রবলেম'-এ আছে। লেখাটি লিখেছেন আইনার হাউগান, নাম 'কার্স অব বাবেল' অর্থাৎ 'বাবেলের অভিশাপ'। তাতে তিনি বাইবেলের গল্পটি পুনরাবৃত্তি করেছেন। তাতে ছিল এই রকম একটি কল্পকথা : সারা পৃথিবীতে একসময়ে একটি মাত্র ভাষা ও বাচন ছিল। কিন্তু মানুষের মধ্যে অহংকার জন্ম নিল। তারা এমন একটি শহর ও একটি টাওয়ার নির্মাণের চেষ্টা করলো যার চূড়া আকাশস্পর্শী হবে। এতে বিশ্বকর্মা (জিহোবা) ক্ষুব্ধ হয়ে তাদের শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা করলেন। তিনি তারা যে ভাষায় কথা বলতো, তা রহিত করে দিলেন। সুতরাং তারা একজন অপরজনের কথা আর বুঝতে পারে না। এরকম গল্প আরো আছে। একেক সংস্কৃতিতে একেক রকম। ভাষাবিজ্ঞানীরা এ ধরনের কল্পকথায় এখন আর বিশ্বাস করে না। ভাষাবিজ্ঞানীরা জানেন যে প্রতিটি মানব শিশুই নিজের মতো করে একটি ভাষা আয়ত্ত করে নেয় – যাকে বলা হয় ব্যক্তিক বুলি। এ রকম ব্যক্তিক বুলি বিস্তার লাভ করে গোষ্ঠী বা গোত্রিক বুলি গড়ে ওঠে। গোত্রিক বুলি যখন আরো বিস্তার লাভ করে তখন তাকে বলা হয় সম্প্রদায়গত বা জাতীয় ভাষা। ইংরেজিতে বলা হয় কম্যুনিটি ল্যাঙ্গুয়েজ।

বাংলা ভাষা নিয়ে যাঁরা কাজ করেছেন, বিশেষ করে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন আরো অনেকেই প্রকারান্তরে টাওয়ার অব বাবেলের হারিয়ে যাওয়া সূত্রানুসন্ধানের কাজ করেছেন। সে দিক থেকে দেখতে গেলে তাঁরা একই মার্গের যাত্রী। তাঁদের অবদান অবমূল্যায়ন করার সঙ্গত কোন কারণ নেই। তাঁরা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান করেছেন – এ কথা বললে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু বৈচিত্র্য যে ভাষার অন্তর্নিহিত প্রবণতা তা তাঁরা তাত্ত্বিকভাবে আত্তীকরণ করেননি। ভাষার আঞ্চলিক কিংবা ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের উপাত্ত সংগ্রহের কাজ করেছেন জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন। তাঁর সাম্রাজ্যিক দলিল *লিঙ্গুইসটিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া*। বাইবেলের একটি গল্পকে সাধুরীতিতে লিখে তাকে আঞ্চলিক রীতিতে রূপান্তর করার প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছিলেন। ১৮৮৫ সালে শুরু হওয়া এই প্রকল্প সমাপ্তির দিকে যেতে প্রায় ৪৬ বছর সময় লেগে যায়। তিনি যে পদ্ধতিতে কাজ করেছিলেন, তাতেই উত্তর ভারতীয় ও পূর্ব ভারতীয় ভাষাগুলোর ঔপভাষিক পরিসীমা পরিচিহ্নিত করার জ্ঞানের প্রসার ঘটে।

এই ঔপভাষিক বিচিত্রতার বিষয়টি প্রাচীন ভারতীয় সনাতনপন্থী, জৈনপন্থী ও বৌদ্ধপন্থী পণ্ডিতের আলোচনায় স্থান পেয়েছে। বিভিন্ন প্রাকৃতের নামায়ন ও নিয়মবন্ধন যাঁরা করেছিলেন তাঁরা বৈচিত্র্যের কাজই করেছিলেন। দক্ষিণ ভারতে তোলকাপ্পিয়ামও ভাষার নিয়মবন্ধনের কাজ করেছিলেন। তখন বর্ণনাত্মক কাজই তাঁদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল। পরবর্তীকালে ভাষা শিক্ষায় ব্যাকরণের দিকে ঝুঁকে পড়েন দোম আন্তেনিও ও ম্যানোএল দ্য আসসুম্পসাঁও। তাঁদের ধর্মীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের জন্য বাইবেল অনুবাদ করা আর ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য দ্বিভাষিক দক্ষতা

অর্জন করা। পরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তা কর্মচারীরা এ দুটো কাজে মনোযোগী হন। এ দিকে উইলিয়াম জোনস্ ও ওয়ারেন হেস্টিংসের অবদান অস্বীকার করার উপায় নেই।

বিচিত্রতার পর যে বিষয়টা আলোচনায় আসে তা হল বাচনসম্ভার; ইংরেজিতে বলা হয় রিপার্টোয়া। একজন মানব শিশু কিভাবে বাচনসম্ভার ব্যবহার করে তা সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে ছিল অজ্ঞাত। সমাজ ভাষা বিজ্ঞানীরা এক্ষেত্রে নতুন আলোক নিক্ষেপ করে তাকে আলোকিত করে। চার্লস ফার্গুসন তাঁর 'Language Problems of Variation and Repertoire' প্রবন্ধে বাচন সম্ভারকে (ক) ব্যক্তিক বাচন সম্ভার; (খ) দলাত্মক বাচন সম্ভার; (গ) বাচন সম্ভারের বিন্যাসন (ঘ) বাচন সম্ভার পরিবর্তন – এভাবে বিভাজন করে আলোচনার দ্বার উন্মোচন করেন। এই প্রবন্ধেই তিনি দ্বিরীতিত্বের (Diglossia) কথা আলোচনা করেন। ফলে ভাষা অধ্যয়নের সামাজিক দিগন্ত প্রসারিত হয়েছে। ভাষাবিজ্ঞানীরা ভাষা উৎপত্তির প্রাগৈতিহাসিক অভিযাত্রা থেকে শিশুর ভাষা অর্জনের সূক্ষাতিসূক্ষ্ম স্তরগুলো অধ্যয়নের দিকে মনোযোগী হন। ফলে মনোভাষাবিজ্ঞানের মনোদৈহিক বিকাশের অধ্যয়ন নানা মাত্রায় সংসাধিত হতে থাকে।

ভাষা সমস্যা একটি দৈগান্তিক সমস্যা। মানুষ যত উপরে ওঠে ততই দিগন্তকে প্রসারিত দেখতে পায়। যত নিচে থাকে ততই দিগন্তকে সংকুচিত দেখতে পায়। সমস্যা দিগন্তকে নিয়ে নয়, দিগভ্রান্তিকে নিয়ে। দিকভ্রান্তি মানুষের সমস্যা। আমাদের মানসিক অভিধানে চতুর্দিক আছে, দশদিক আছে। চতুর্দিকের অর্থ দেয়া আছে – উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম। আরও একটি অর্থও আছে সেটা হচ্ছে সর্বদিক, সকল দিক। আবার দশদিকের অর্থ দেওয়া আছে: পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঈশান, বায়ু, অগ্নি, নৈর্ঋত, ঊর্ধ্ব ও অধঃ। তারপর দ্বিতীয় অর্থ দেওয়া আছে সর্বদিক। (বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, পৃষ্ঠা ৩৯৮, ৫৯১, পরিমার্জিত সংস্করণ, ১৯৯২) অর্থাৎ যা দশ তাই চার। গণিতবেত্তারা একথা মানবেন বলে মনে হয় না।

ভাষা শেখার সমস্যাগুলো যৎসামান্য আলোচনা করা যাক। কিঞ্চিৎ বিস্তারিত আছে মনসুর মুসার 'ভাষা, শিক্ষা ও ভাষাশিক্ষা' সংকলনে। প্রথম ভাষা যে মানব শিশুরা প্রায় সাড়ে তিন বছরের মধ্যে রপ্ত করে, তা কীভাবে করে তা যে শিখছে সেও জানে না। তার পিতামাতাও খুব ভাল জানেন না। এরকম অর্ধ-সচেতন, অর্ধ-অচেতন অবস্থায় শিশুরা প্রথম ভাষা শিখে নেয়। এই প্রক্রিয়ার সমস্যাবলি মনোবিজ্ঞানীরা সামান্য অবগত, মনোভাষাবিজ্ঞানীরা কিঞ্চিৎ অবগত, স্নায়বিক ভাষা বিজ্ঞানীরা কিঞ্চিৎ অবগত। বিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে এ ব্যাপারে বিদ্বানদের উৎসাহ উজ্জীবিত হয়েছে। পাশ্চাত্যে এ ব্যাপারে বেশ কিছু ক্ষেত্র সমীক্ষা হয়েছে। এখনও গবেষণা চলছে। ভাষা অর্জনের এই এলাকাগুলো এখনও সুস্থির হয়নি।

ভাষা-অর্জন কথাটা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। ভাষা-অর্জন মানে কোনো ভাষার ধ্বনিমালা বুঝতে পারা, শব্দাবলি বুঝতে পারা, সর্বোপরি অর্থ বুঝতে পারা। ইংরেজিতে বলা হয় কম্প্রিহেসশন। তারপর যে ব্যাপারটা লক্ষ্যযোগ্য তা হচ্ছে এই উপলব্ধি যে কোনো আওয়াজ নয়, শুধু মানব কণ্ঠনিঃসৃত আওয়াজ ও অন্যান্য পাশবিক কিংবা যান্ত্রিক ধ্বনির পার্থক্য বুঝতে পারা। এটা হচ্ছে অর্জনের এক মাত্রা, আরো মাত্রা আছে। সেটা হচ্ছে, যে আওয়াজ শিশুর উপলব্ধিতে এলো তা উৎপাদন, ইংরেজিতে বলা হয় প্রোডাকশন করতে পারা। উপলব্ধি আর উৎপাদনের ভেতরে যে অর্থগত সূত্র আছে তা অনুধাবন করা। মোটা কথায় এই হলো ভাষা অর্জন। শিশুর ভাষা অর্জনকে প্রথম ভাষা অর্জন বলা হয়। এ ক্ষেত্রে জনপ্রিয় শব্দ হচ্ছে মাতৃভাষা অর্জন। মাতৃভাষা অর্জন কথাটা আবেগাত্মক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক নয়। কারণ শিশুরা শুধু মায়ের কাছ থেকে শেখে না, পরিবারের অন্য সদস্যদের কাছ থেকেও ভাষা উপকরণ গ্রহণ করে।

ভাষা অর্জনের সমস্যা অনুধাবনের জন্য ভাষার অবয়ব সংগঠন ও তার বৃত্তিগুলো বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। ভাষার অবয়ব বলতে ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বিন্যাস, ভাষার শব্দ গঠনের প্রক্রিয়া, ভাষার বাক্যতাত্ত্বিক বিন্যাস ও বৈচিত্র্য, ভাষার অর্থতাত্ত্বিক জটিলতা ও প্রায়োগিক রীতি পদ্ধতি বোঝানো হয়ে থাকে। এই অবয়ব সংগঠন ও বৃত্তি কোনো একদিনে কিংবা একমাসে কিংবা এক বছরে সম্পন্ন হয় না। শিশুর ভাষা অর্জন নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন কিংবা এখনও করছেন তাদের প্রত্যেকেই বিস্মিত হয়ে মন্তব্য করেছেন – এ রকম একটি জটিল সংশ্রয় কিভাবে এত অল্প সময়ে শিশু অর্জন করে। এটকিনসন বলেছেন– "The study of Language acquisition is extraordinarily difficult, and perhaps, One should yield to the temptation of applauding what has been achieved and let matters rest there." একই রকম কথা বলেছিলেন Jacobs – "The more we learn about Language, the more ignorant we find we are".

শিশুর ভাষা অর্জন সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক উৎসাহ বিগত শতকের পাঁচ-এর দশকের ভাষাবিজ্ঞানীদের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক অনুসন্ধানকে ব্যাপ্তি দান করে। এ ক্ষেত্রে নোয়াম চমস্কি, জর্জ এ মিলার, এরিক লেনেবার্গ ও তাঁদের অনুবর্তীদের কথা স্বীকার করতেই হয়, তবে জন লাইনস্ ভাষা বিজ্ঞানের ইতিহাস ঘেঁটে দেখিয়েছেন যে একজন জার্মান জীববিজ্ঞানী যার নাম টাইডমান (Tiedmann ১৭৭৩-১৮৫৩) ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর নিজের সন্তানের ভাষা অর্জনের খতিয়ান রেখেছিলেন। মনে রাখা দরকার, ডারউইনের (১৮০৯-) *অরিজিন অব স্পেসিস* মাত্র ১০ বছর আগে ১৮৭৭-এ প্রকাশিত হয়েছিল। তারা পরস্পরকে কতটা প্রভাবিত করেছিলেন তা জানা যাচ্ছে না। তবে টাইডমানকে পর্যবেক্ষণমূলক মনোবিজ্ঞানীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এ ধরনের পর্যবেক্ষণমূলক শিশুর ভাষা অর্জনের কাজ বঙ্গদেশের ভাষা বিজ্ঞানীদের আকৃষ্ট করেনি। একমাত্র ব্যতিক্রম খাতেমন আরা, পাকিস্তান আমলে ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত তাঁর দুই মেয়ে ও দুই ছেলের ভাষা বিকাশের বিবরণী লিখে রেখেছিলেন। সেই পর্যবেক্ষণমূলক কাজটি আমাদের জানামতে একমাত্র ভাষাবিকাশ সম্পর্কিত কাজ। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা কিংবা অন্যত্র কোনো কাজ হয়েছে কিনা জানা নেই।

ভাষা নামক প্রপঞ্চটা একদিকে যেমন বিশাল, অপরদিকে তেমনি জটিল। ভাষা সম্বন্ধে যখন মানুষের অনুসন্ধিৎসা দেখা দেয়, তখন ভাষার উৎপত্তির হদিস নেওয়াকে তারা প্রাধান্য দেন। উৎপত্তি অনুসন্ধান করতে গিয়ে এক পর্যায়ে 'হোমোসেপিয়ানদের' আবির্ভাব কাল পর্যন্ত গিয়ে অনুসন্ধান দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় ১৮৮৬ সালে ফরাসি একাডেমি এ অনুসন্ধানের কাজ থেকে অনুসন্ধিৎসুদের বিরত থাকতে নির্দেশনা দেন। কিন্তু মানুষের মনে যখন প্রশ্ন দেখা দেয়, সে প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত মানুষ সোয়াস্তি অনুভব করে না। তখন বিকল্পিক উপায় হিসেবে ভাষার সংগঠন নিয়ে কাজ শুরু করে। তখন পণ্ডিতেরা গুহা মানবের মস্তিষ্কের খুলির মগজের খবর নেওয়ার পরিবর্তে তারা নিজেদের দিকে ফিরে তাকান। মৃত মানুষের ভাষা অনুসন্ধানের বিকল্প হিসেবে জীবিত মানুষের দেহের দিকে নজর দেন। তখন তাঁরা দেখতে পান, ফুসফুস থেকে যে পবন শ্বাসনালী, স্বরযন্ত্র, মুখগহ্বর, নাসিকা গহ্বর, জিহ্বা, আলজিহ্বা, অধিজিহ্বা, ওষ্ঠাধর ইত্যাকার প্রত্যঙ্গের বৃত্তি অর্থাৎ ফাংশান নিয়ে কাজ করে। তাতে ভাষা উৎপাদনের প্রক্রিয়া উপলব্ধির নতুন পথ খুলে গেল। ভাষাতত্ত্ব দেহবিজ্ঞানের পথ অনুসরণ করলো।

ভাষা প্রপঞ্চটা শুধু দেহের ভেতর অবস্থান করে না, মুখ থেকে বেরিয়ে ইথারে ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে নজর দিতে গিয়ে দেখা গেল মানুষের মুখমণ্ডল থেকে যে বায়ু বেরিয়ে আসে তা বায়ুমণ্ডলে তরঙ্গ উৎপাদন করে। সে তরঙ্গ যদি ২০ ডেসিবলের কম হয়, তাহলে অপর মানুষ শুনতে পায় না, আবার সে তরঙ্গ যখন ২০,০০০ তরঙ্গের অধিক হয় তবে তাও মানুষ শুনতে পারে না। শোনা মানুষের কানের কাজ; দেখা গেল কানের ডাক্তারেরা কানকে বহিকর্ণ, মধ্যকর্ণ, অন্তকর্ণ এভাবে বিভাজন করে তাকে মস্তিষ্কের সঙ্গে সংযুক্ত করে। কথায় বলে কান টানলে মাথা আসে। ফলে ভাষার বৃত্তি খুঁজতে গিয়ে মাথার ভূমিকা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন হলো; যা ছিল ধ্বনিবিজ্ঞানের বিষয় তা হয়ে দাঁড়ালো মস্তিষ্ক বিজ্ঞানের। মস্তিষ্কের ভেতরে যাকে আমরা সহজ কথায় মগজ বলি, তার ওজন নিয়ে দেখা গেল – এই মগজ মোটামুটি দেড় কিলোগ্রামের মতো। এই দেড় কিলোগ্রামের তথ্য নিয়ে দেখা যাচ্ছে তার প্রধান দুটো এলাকায় ধ্বনিতরঙ্গ প্রক্রিয়াজাত হয়। একটি হলো ব্রোকার এলাকা (নামাঙ্কিত হয়েছে ফরাসি শল্য-চিকিৎসক পিয়েরে ব্রোকার (১৮২৪-১৮৮০) অপরটি ওয়ার্নিক এলাকা (নামাঙ্কিত হয়েছে জার্মান স্নায়বিক ওয়ের্নিক (১৮৪৮-১৯০৪)। এদের অবস্থান দুই মেরুতে,

বাম মেরুতে আর ডান মেরুতে। আবার এই দুই মেরু পরস্পরকে নানাভাবে সাহায্য করে। ভাষাবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী, সংখ্যা বিজ্ঞানী এই দেড় কিলোগ্রাম বস্তু নিয়ে গবেষণাগারে প্রবেশ করলেন। দেখা যাচ্ছে ব্যাপারটা এতই সূক্ষ্ম ও জটিল যে, যেকোনো একক বিদ্বান সেখানে দিশে হারাচ্ছে। যৌথ সহযোগিতায় যাঁরা অংশ গ্রহণ করলো তাঁদের অভিধা হলো মনোভাষাবিজ্ঞান।

বাচন প্রক্রিয়ার স্বরূপ জানতে গিয়ে মানবমনীষা যখন মস্তিষ্কে প্রবেশ করেছেন, তখন মস্তিষ্ক সম্বন্ধে দু একটি কথা জানা প্রয়োজন। আমাদের দেশের একজন চিকিৎসক মানব মস্তিষ্ক নিয়ে একটি ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, সেটা প্রকাশ করেছে বাংলা একাডেমি। লেখক প্রয়াত। নাম হুমায়ুন কে. এম. এ. হাই। তিনি লিখেছেন–

"প্রায় এক সহস্রকোটি একক স্নায়ুকোষ বা নিউরণ নিয়ে গঠিত এই মহাকেন্দ্রে অসংখ্য যোগাযোগ পথ, অসংখ্য বিশ্লেষণ কেন্দ্র ও একটি বিরাটাকার স্মৃতিভাণ্ডার রয়েছে। প্রতি মুহূর্তে দেহের বিভিন্ন স্থান থেকে যে অসংখ্য স্নায়বিক বার্তা মস্তিষ্কে আসে ও মস্তিষ্ক থেকে যে অসংখ্য বার্তা দেহের বিভিন্ন অংশে যায়, এরা মূলত বৈদ্যুতিক সংকেত। অন্তর্মুখী সংবেদী (Sensory) সংকেতগুলি নানা গতিতে, নানা মাত্রায় ও নানা সংযোগে বিভিন্ন স্নায়ুপথ বেয়ে মস্তিষ্কে আসে। স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন স্তরে বহু সংযোগস্থল রয়েছে। সংযোগস্থলে বার্তাসমূহ সংকলিত ও সংশোধিত হয় এবং এদের মধ্যে সহযোগ (Association) সাধিত হয়। মস্তিষ্কই এরূপ স্নায়বিক সংযোগ ও সহযোগের অন্তিম স্তর। নিদ্রায় ও জাগরণে, চেতন ও অবচেতন অবস্থায় – প্রতিটি মুহূর্তে অসংখ্য স্নায়বিক উত্তেজনা মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলির মধ্যে এক উত্তেজনার নকশা সৃষ্টি করে। পুনরায় বহিমুর্খী সংকেত চিহ্ন মস্তিষ্কে সৃষ্টি হয়ে সেখান থেকে নির্গত হয় ও মোটর (motor) স্নায়ুপথ বেয়ে দেহের বিভিন্ন গ্রন্থি ও পেশীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এসকল বহির্মুখী সংকেতচিহ্নই মস্তিষ্কের শাসন ও নিয়ন্ত্রণের বার্তা দেহের সব জায়গায় নিয়ে যায়।"

চিকিৎসক হাই স্নায়বিক ভাষাবিজ্ঞানের সাথে পরিচিত ছিলেন না। তিনি 'বার্তা' প্রক্রিয়াকরণের কথা বলেছেন। কিন্তু বার্তায় বাচননির্ভরতা আছে সেদিকে দৃষ্টি ফেরাননি। তখন এ রকম আন্তঃজ্ঞানশৃঙ্খলার আগ্রহ প্রবল ছিল না। তদুপরি তার আবস্থানিক পরিবেশও অনুকুল ছিল না।

ভাষার রহস্য অনুসন্ধানের কাজ শুরু হয়েছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিয়ানডার্থাল পরবর্তী হোমোসেফিয়ানদের মাথার খুলির মগজের মধ্যে কথা বলার শক্তি নিহিত ছিল কি না এই হাইপোথেসিস নিয়ে। সে অনুসন্ধান প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুসন্ধান। পরে অন্য বিদ্যাশৃঙ্খলার বিশেষজ্ঞরা কেউ সমাজ সংগঠন, কেউ প্রাযুক্তিক বিকাশে, কেউ বিবর্তনের জেনোম পরীক্ষার মাধ্যমে রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন। মানুষের মস্তিষ্ক সম্পর্কিত জ্ঞানের একটি প্রতিবন্ধকতা ছিল। দেহ বিজ্ঞানীরা যে মগজ নিয়ে

কাজ করতেন সে হচ্ছে প্রাণহীন অবয়বের মগজ। ফলে প্রাণবান মানুষের মস্তিষ্কটি ছিল ব্ল্যাক বক্স বা কালো বাক্স। এই কালো বাক্সের খবর পেতে হলে বাচনের ইনপুট ও আউটপুট বিশ্লেষণ করে যতটুকুন খবর আসতো তাই ছিল তাদের জ্ঞানের সম্বল। কিন্তু বিগত চল্লিশ বছরের প্রাযুক্তিক অগ্রগতি মানুষকে এতটা বলবান করে তুলেছে যে মানুষ এখন জীবন্ত মস্তিষ্কের কার্যকলাপ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া স্বচ্ছতার সঙ্গে দেখতে পাচ্ছে। ভাষা যে মানুষের সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল, তার বোধহয় সমাধানের আলো দেখা যাচ্ছে।

গ্রন্থপঞ্জি

মহম্মদ দানীউল হক, ২০০৯। *ভাষা আয়ত্তকরণ ও শিখন: প্রাথমিক ধারণা*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি

রফিকুল ইসলাম, ১৯৮০। 'ভাষাতত্ত্বের বিবর্তন', *ভাষাবিজ্ঞান পত্রিকা*, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৫০

হুমায়ুন কে. এম. এ. হাই, ২০০৩। *মানব মস্তিষ্ক*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি

Atkinson, Martin, 1982. *Explanations in the Study of Child Language Development,* Cambridge Linguistics Press, Cambridge Studies in Linguistics, P. 35

Begum, Khatuman Ara, 2001. *The Language Development of Children*, Institute of Education and Research. University of Dhaka

Crystal, David, 1976. *Child Language Learning and Linguistics*, An Overview for the Teaching and Terapevtic Profession, Edword Arnold

DEDALUS: *Journal of the American Academy of Arts and Science. Summer (1973),* Language as a Human Problem, Vol. 102, No. 3

Jacobs, Roderick A. Jacobs, 1973. *Studies in Language,* Xerox College Publishing MassachuSetts/ Torento, P-11

Lyons, John, 1970. *New Horizon of Linguistics*, Penguin. P. 242-260

Robins. R. H., 1967. *A Short History of Linuestics*, London, Longman

William, O'gradx, Dobrovolsy, Michael, Katamba, Francis. (3rd edition), 1996. *Contemporary Linguistics: An-Intuduction*, London, Lougman

Wordhaugh, Ronald, 1976. *The Contexts of Language*, New bury House Publishers, Rowley, Masschusetts